2000 First Global Ministerial Environment Forum (Malmö).
2000 UN Millennium Declaration (with Sustainable Development as one of the goals).
2002 World Summit on Sustainable Development.
2005 Kyoto Protocol on Climate Change enters into force.
2005 Bali Strategic Plan for Technology Support to less developed countries.
2005 Millennium Ecosystem Assessment.
2007 Bali Summit to implement Kyoto Protocol.

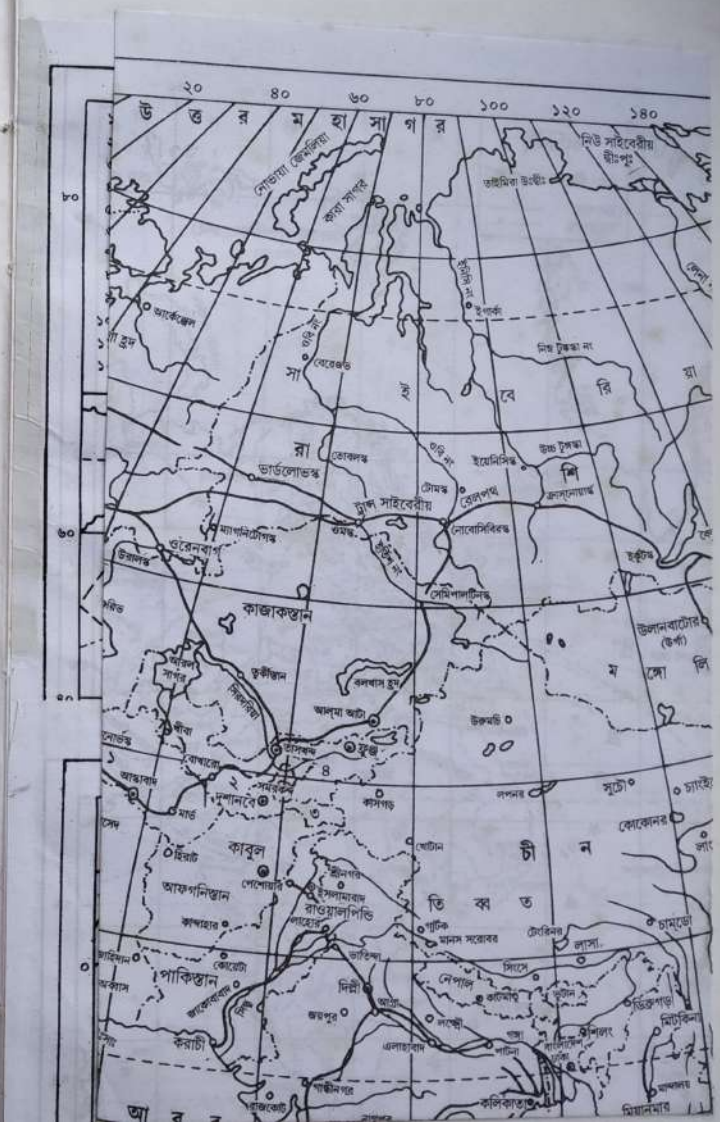

যাইহোক, কিয়োটো প্রটোকলের দ্বারা যে সব আচরণ-বিধি নির্ধারিত হল, তার মূলনীতিগুলির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। এগুলি হল ঃ

১. দূষণের দায় প্রদূষকের, যারা এর শিকার তারা নয় (pollutor pays, not the victims) ;
২. তুলনামূলকভাবে কমপ্রদূষক অথচ উন্নয়নের দাবিদার যে সব দেশ তাদের ক্ষেত্রে টানা দশবছরের ছাড় protocol-এর বিধিনিষেধ থেকেও ;
৩. দূষণের ক্ষতিপূরণ বহন করতেই হবে উন্নত দেশগুলিকে এবং
৪. দূষণমুক্ত প্রযুক্তি ও পরিষেবা হস্তান্তর করতে হবে উন্নত থেকে অনুন্নত দেশগুলিকে।

বলা দরকার, কিয়োটো প্রটোকলের নির্দেশগুলি সুস্পষ্ট এবং অনতিক্রম্য। প্রটোকলের ১০ নম্বর ধারায় সমস্ত স্বাক্ষরকারী দেশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

১. আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গ্রিন হাউস গ্যাসের নিয়মিত পরিমাপ রাখা ;
২. স্থানীয় স্তরে গ্যাস-বিকিরণ হ্রাস করার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণ ;
৩. পরিবেশ-অনুকূল প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসারে অর্থ বিনিয়োগ ; এবং
৪. এক এক অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত গ্যাসকণার অবলুপ্তির জন্য বিশেষ ধরনের ছাঁকুনি ব্যবস্থা স্থাপন। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক বনসৃজন, ভূ-সম্পদের সদ্ব্যবহার, জলাশয় সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে দুভাগে ভাগ করেছে (ক) শিল্পায়িত দেশগুলি যারা অঙ্গীকার করেছে প্রদূষণের নির্দিষ্ট মাত্রা আর ছাড়াবে না, তারা পাঁচ শতাংশ হারে কমিয়ে কমিয়ে ১৯৯০-এর নির্ধারিত স্তরের নীচে নেমে আসবে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে (খ) অন্য শ্রেণীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা ও EU-ভুক্ত দেশগুলি যারা অন্তত আট শতাংশ হারে দূষণ কমাতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া (ক) ও (খ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি নিজ দেশে ছাড়াও অন্য দেশে 'নির্মল উন্নয়ন ব্যবস্থা' (CDM বা Clean Development Mechanism) স্থাপন করলে সেই বাবদ অতিরিক্ত ক্রেডিট বা উদ্বৃত্ত সংখ্যা অর্জন করতে পারবে যার বিনিময়ে নিজদেশের ঘাটতি সামাল দেওয়া সহজ হবে।

এইসব বিধিবিধান কার্যকরী হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Compliance Committee গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে একটি সর্বসদস্যের মঞ্চ (Plenary body) একটি কর্মদপ্তর (Operational Bureau) এবং

দুটি বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শাখা, যার একটির কাজ প্রটোকলের ব্যবস্থাদির সহায়তা করা এবং অন্যটির কাজ নজরদারি ও নিয়ম বলবৎ করা।

২০০৯ সাল ধরা হয়েছিল কিয়োটো প্রটোকল পৃথিবীর সর্বত্র চালু করা। ২০০৫ সালের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ এই প্রটোকলে স্বাক্ষর দান করে। কিন্তু গোড়া থেকেই অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে এসেছে তিনটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সময়সীমা আসন্ন হয়ে আসছে দেখে পৃথিবীর অন্য সব দেশ, যারা এই প্রটোকলে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, তাদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭-এর ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে। সেখানেই শেষ আহ্বান জানানোর পর একে একে ঐ তিনটি বিরোধী দেশ প্রটোকলে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হয়। এর ফলে প্রটোকলের আয়ুষ্কাল ২০১২-এ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই UNFCC-সহ প্রটোকলের নির্দেশাবলী একটি প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক বিধানে রূপান্তরিত হওয়ার পথ পরিষ্কার হল।

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতার তালিকা (1972-2007)

1972 UN Conference on Human Environment (Stockholm) leading to establishment of UNEP.
1975 Mediterranean Action Plan under UNEP Regional Seas Programme.
1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozonelayer.
1988 Inter-governmental Panel on Climate Change.
1989 Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes.
1992 Earth Summit/UN Conference on Environment and Development.
1992 Framework Convention on Climate Change.
1992 Bio-Diversity Convention.
1994 Convention to Combat Desertification.
1995 Global program to protect Marine Environment from Land based sources of Pollution.
2000 Cartagena Protocol on Bio-safety (regarding genetically modified organisms).

বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য পরিবেশ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল 'The Framework Convention on Climate Change' অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে কাঠামোগত চুক্তি (UNFCC 1992) এবং 'The Convention on Biodiversity' অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি (২০০২)।

UNFCC-তে বায়ুস্তরে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসপুঞ্জের ঘনীভবনের ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়নের জন্য একেই কারণ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। যে গ্যাস ইতিমধ্যে ক্রমপুঞ্জিত হয়ে গেছে, তার থেকে আপাতত রেহাই পাওয়ার পথ নেই। কিন্তু বর্তমান কালপর্ব থেকে গ্যাস উদ্‌গিরণের পরিমাণ এমন হারে ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার চেষ্টা হওয়া দরকার যার দ্বারা এর ক্ষতিকর প্রভাব আর বৃদ্ধি না পায়। না হলে পৃথিবীর জলবায়ু বিপজ্জনকভাবে বেহাল হয়ে পড়বে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করবে। কনভেনশনে স্বীকার করা হয়েছে যে উন্নত দেশগুলির তুলনায়, উন্নতিশীল দেশগুলির থেকে উত্থিত গ্যাসের অংশ অনেক কম এবং উন্নয়নের প্রয়োজনেও সামাজিক অবস্থার বিচারে এখনও এসব দেশ থেকে কিছুটা উষ্ণায়নের সম্ভাবনা মেনে নিতেই হবে। সব দেশেরই বায়ুদূষণ রোধে দায়িত্ব থাকলেও উন্নত দেশগুলির দায় বেশি এই কারণে যে অতীতে এমনকি বর্তমানেও তাদের দিক থেকে গ্যাসীয় পদার্থের উদ্‌গিরণের মাত্রা প্রচুর। সুতরাং জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। উত্থিত গ্যাসের প্রকোপ কমানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা বা পরিমাণ এই কনভেনশনে উল্লেখিত হয়নি। সময়সীমাও সেভাবে নির্ধারিত হয়নি। এই কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে আরও কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে। পরে কিয়োটো প্রটোকল-এর বিভিন্ন ধারায় অত্যাবশ্যক পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রটোকল UNFCC-র সংশোধন রূপে গৃহীত হয় ১৯৯৭ সালের December তারিখে জাপানের Kyoto শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বসম্মেলনে। বিশ্বের ১৬৬টি দেশ এতে যোগ দয়ে। Kyoto প্রটোকল আইনত বাধ্যতামূলক কতকগুলি দায়দায়িত্ব নির্দেশ করে দিয়েছে। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিকে বলা হয়েছে তাদের সম্মিলিত 'গ্রিন হাউস গ্যাসের' পরিমাণ ২০০৮ থেকে ১২ সালের মধ্যে এমনভাবে কমিয়ে আনতে হবে যেন অবশিষ্ট পরিমাণ ১৯৯০ সালের গড়পড়তা পাঁচ শতাংশ মতো হ্রাস পায়। সেজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, জ্বালানি তেল ও কয়লার ব্যবহার কমানো, জীবাশ্ম-ঘটিত (fossil fuel)-এর বিকল্প শক্তির উৎস (যেমন সৌরশক্তি, তরঙ্গশক্তি, বাতাসের শক্তি) সন্ধান ও ব্যবহার, গ্যাস উদ্‌গিরণকারী শিল্পগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা উদ্‌গিরণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য এই উপায়গুলি বিভিন্ন দেশ নিজের নিজের সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী অবলম্বন করবে। একই সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনে দূষণ কিছুটা হ্রাস করা গেলেও একেবারে বন্ধ করা যাবে না। দূষণের মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯০-এর প্রাপ্ত হিসেবকে ভিত্তি হিসেবে ধরলেও বৃহৎ শিল্পনির্ভর দেশগুলির থেকে সৃষ্ট দূষণ উঁচু দিকেই থাকবে। তবে দেশ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলা যায় দূষণ কোন্ অঞ্চল থেকে বেশি বা কম হচ্ছে তাতে বিচলিত না হয়ে সারা বিশ্বের মোট দূষণের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে কিনা তার ওপর নির্ভর করবে পৃথিবীর পরিবেশের ভবিষ্যৎ। সুতরাং প্রথম কয়েক বছর উন্নত কোনো রাষ্ট্র যদি সুপারিশমতো পাঁচ শতাংশ হারে গ্যাস উদ্‌গিরণ কমানোর মাত্রা পূরণ করতে না পারে তাহলে একটি বন্দোবস্ত করা হয়েছে যার দ্বারা সারা পৃথিবীর মোট দূষণ হার ঠিক রাখা যায়। এর নাম GHG Emissions Trading অথবা ঘাটতির সঙ্গে উদ্বৃত্তের বিনিময়, যার অন্য নাম Cap and Trade অর্থাৎ যেসব দেশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে তারা এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি অর্থমূল্য দিতে বাধ্য থাকবে এবং সেই অর্থভাণ্ডার থেকে উৎসাহ দান প্রকল্প অনুসারে পুরস্কৃত হবে অন্যান্য দেশ যারা লক্ষ্যমাত্রারও অনেক কম দূষণ ঘটাচ্ছে। এজন্য খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে আন্তর্জাতিক স্তরে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই বন্দোবস্ত সমর্থনযোগ্য। কারণ, উন্নত কয়েকটি দেশে দূষণ কমানোর খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি। তার চেয়ে কম খরচে অন্য দেশে দূষণ কমানো সম্ভব হলে, যারা দূষণ রোধে সফল নয়, তাদের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকাতেই অন্য দেশগুলিতে দূষণ কমবে এবং বিকল্পশক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রযুক্তিও কেনা চলবে। এই বিনিময় প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বাজার তৈরি হয়েছে। যেমন গ্রিন হাউস গ্যাসের বিকিরণ জাত উদ্বৃত্ত বিনিময়ের বাজার ইয়োরোপীয় সংঘে, অম্ল-বিষযুক্ত বৃষ্টির দরুন দূষণের বাজার হয়েছে আমেরিকায়। কার্বন বাজার গড়ে উঠেছে লন্ডনে। সমালোচকেরা অবশ্য বলছেন, বিষাক্ত গ্যাস বিকিরণের অপরাধ প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে বন্ধ হবে না ; দূষণমাত্রা হ্রাসের বদলে একটি পলায়নের পথ (escape clause) বাৎলানো হয়েছে বিকিরণ-বাজারের ফর্মুলায়। তাঁদের বক্তব্য, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আরও বেশি গোষ্ঠীস্বার্থ সচেতন হওয়া প্রয়োজন। খোলাবাজারে বেচা-কেনা প্রশ্রয় দেওয়া এই ধরনের কার্যক্রমের অঙ্গ হতে পারে না। স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় বিকিরণের জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারের কাছ থেকে অনুমতিপত্র (emission licence) আদায় করে নেবে। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়ায় গ্যাস-বিকিরণের ওপর নিয়মিত নজরদারিতে কতটা স্বচ্ছতা থাকবে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বাড়ছে, খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়ছে এবং উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে নিজের দেশের অপরাধ গোপন রাখা অসম্ভব বুঝে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময় নিতে চান যাতে ধীরে ধীরে মার্কিন শিল্পসংস্থাগুলি তাদের বিষাক্ত গ্যাস-বিকিরণের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারে। ["countries like India and China are experiencing rapid economic growth.....This also means that they are emitting increasingly large quantities of greenhouse gases which has consequences for the entire global climate", PTI, *Statesman*, 18 April 2008] সুতরাং কোনো দেশকে "free ride" দেওয়া চলবে না এমন কথা তিনি Paris-এ অনুষ্ঠিত ১৬টি বৃহৎ শিল্পে অগ্রসর রাষ্ট্রের সভায় উচ্চারণ করেন। ঐ ১৬টি দেশ মোট উদ্‌গীরণ মাত্রার প্রায় আটাশ শতাংশের জন্য দায়ী। দূষণ-মাত্রা রোধ করায় যেখানে সারা বিশ্ববাসীর স্বার্থ এবং নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে, সেখানে এ ধরনের Major Economies' Conference যেন পুরনো North-South বিভেদকে আবার জাগিয়ে তুলতে চায়। এরপর July ২০০৮-এ G-8 শীর্ষ সম্মেলনে ধনীদের এই ক্লাব ২০৫০ অর্থাৎ আরও পঁচিশ বছর পিছিয়ে দিতে চায় বাধ্যতামূলক দূষণ প্রতিরোধের কার্যক্রম। এর জবাবে ভারতসহ পাঁচটি দেশ (ভারত, চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা) একটি পাল্টা G8+5 ঘোষণায় ঐ দীর্ঘসূত্রতার সমালোচনা করে এবং December ২০০৭-এ যে Bali কাঠামো চুক্তি হয়েছিল সেই মতো ক্রমহ্রাসমান বিকিরণমাত্রা কার্যকর করার জন্য 'full and effective implementation' দাবি করে উন্নত G-8 দেশগুলির কাছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন ঃ "You must all show the leadership that you have always promised by taking and then delivering truly significant GHG emissions" আশার কথা, বুশ-পরবর্তী ডেমক্র্যাট প্রশাসনের রাষ্ট্রপ্রধান ওবামা পরিবেশ প্রশ্নে সদর্থক ও প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ করেন ও Kyoto অনুশাসন মানবেন বলে মনে হয় । [*Times of India*, 10 July, 2008]

যখন বলা হয় অনুন্নত দেশের মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করায় অভ্যস্ত, তখন স্মরণে রাখা দরকার যে দারিদ্র্য হল পরিবেশগত সংকট সৃষ্টির যত না কারণ তার চেয়ে বেশি তার ফলশ্রুতি (Poverty is both the cause and the effect of environmental problems) উন্নয়নশীল দুনিয়া এক দুষ্ট চক্রে পতিত হয়েছে। একদিকে পরিবেশের উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্যকে বিদায় দিতে হবে। অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রথাসিদ্ধ পথে শিল্পায়নের উদ্যোগ নিলে পরিবেশ দূষিত হবেই। এজন্য দরকার উন্নয়নের বিকল্প সংজ্ঞায়ন।

পরিবেশ দূষণ-নিয়ন্ত্রণের অন্য বড়ো প্রয়োজন হল, বর্তমান যুগের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য পরিবেশ যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তার মাশুল বর্তমান প্রজন্মের চেয়েও ভবিষ্যৎ প্রজন্মে অনেক বেশি পরিমাণে দিতে হবে। সুতরাং পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, উন্নয়নকে বজায় রাখতে হলে সবদিক থেকে সেই উন্নয়নকে হতে হবে 'Sustainable' অর্থাৎ বজায় রাখার উপযুক্ত। উন্নয়ন হবে ন্যূনতম ক্ষতিসাধক, অপচয় বিরোধী এবং পরিবেশ অনুকূল।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

পরিবেশ অবক্ষয়ের দায় যেহেতু সমাজের সব স্তরেই কোনো না কোনোভাবে প্রযোজ্য, সেহেতু এর প্রতিকারের উদ্যোগ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সব স্তরেই গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় স্তরে পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ ও তজ্জনিত বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি যেমন জরুরি, তেমনই আবশ্যক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক বিধি-বিধান প্রণয়নে রাষ্ট্রের সক্রিয়তা। আবার রাষ্ট্রকে এই কাজে প্রণোদিত করতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্যোগ অপরিহার্য। পরিবেশগত সমস্যা যেহেতু রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, সীমানা অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রকোপ ব্যাপ্ত হতে পারে, সেজন্য পরিবেশসংরক্ষণের আন্তর্জাতিক মাত্রা এখন ক্রমশই প্রকট হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় স্তরে পরিবেশভাবনার প্রথম সংগঠিত প্রকাশ UNO-র আহূত Oslo বিশ্বসম্মেলনে (১৯৭২)—যেখান থেকে UN Environment Programme (UNEP)-এর উদ্ভব। এই প্রথম একটি স্থায়ী সরকারি মঞ্চ সৃষ্টি হল পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পর্যালোচনার এবং যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের। আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যেসব ব্যবস্থাপনা চলছে তার ভিত্তি বহুপাক্ষিক চুক্তি বা Convention, যা UNO-এর উদ্যোগে আহূত সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ক্রমে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অনুমোদনের পর আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। চুক্তির মতো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও অন্য আর এক ধরনের বিধানপত্রও প্রযুক্ত হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে, এগুলি Protocol নামে অভিহিত। একটি বিদ্যমান চুক্তির পরিশিষ্ট হিসেবে অথবা কোনো বিশেষ ধারার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশদ বক্তব্য থাকে প্রটোকলে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে গৃহীত সিদ্ধান্ত (resolution) এবং ঘোষণা (Declaration)গুলিও পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদিও সেগুলি চুক্তির মতো বাধ্যতামূলক নয়।

বিপদ সংকেত থেকে সতর্কতা ও তার রাজনৈতিক তাৎপর্য

এই বিপদ সংকেতগুলি আনুমানিক নয়, নয় অকারণ-আশঙ্কা-প্রসূত। দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে বিজ্ঞানীমহলে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপন, পরীক্ষণ ইত্যাদি একটানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবিসংবাদিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় ও উষ্ণায়ন সংক্রান্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য। দেখা যাচ্ছে ঃ এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, শিল্পজাত দূষণরোধে ব্যর্থতা, সীমিত প্রাকৃতিক ও জৈব সম্পদের অপচয়, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ, রাসায়নিক ও পারমাণবিক বস্তুর অপব্যবহার, এবং অবশ্যই আত্মঘাতী অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও সীমাহীন ভোগবাদ।

বলাবাহুল্য এই সব কারণের প্রত্যেকটি মুনষ্যসৃষ্ট। সুতরাং মানুষের সচেতনতা ও যৌথ চেষ্টার দ্বারাই এগুলি দূর করা সম্ভব। তবে এও স্বীকার করতে হবে যে এই ধরনের বিপথগামী সভ্যতার উদ্ধারে রাষ্ট্রেরও ভূমিকা কম নয়। কারণ উন্নয়নের নামে, শিল্পায়নের নামে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামে আজ পর্যন্ত যেসব অপকর্ম ঘটেছে, রাষ্ট্র কখনো তার প্রত্যক্ষ সহায়ক, কখনো পরোক্ষ প্ররোচক, কখনো নীরব দর্শক এবং নিশ্চিতভাবেই সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর পরিপোষক। সেক্ষেত্রে সংগঠিত পুরসমাজের নিয়ন্তা এবং জাতীয় অর্থনীতির ও জাতীয় উন্নয়নের পুরোধা হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় নিবারণের জন্য একক এবং যৌথ উভয়ই সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার। সেইসঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি মহল কে কতটা দায়িত্বপালনে বাধ্য সেটাও স্থির হওয়া দরকার রাষ্ট্রের নির্দেশেই। সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তি ও পরিবারের যে সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার সে বিষয়ে ব্যাপক জনচেতনা জাগ্রত করাও পুরসমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের মিলিত প্রয়াস হতে হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় গত শতকের আশির দশকের আগে পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রকে সেভাবে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রত্যক্ষ ফলাফল ও আধুনিক শিল্পনির্ভর উন্নয়ন সম্বন্ধে শিক্ষিত জনমানসে প্রতিক্রিয়ার দরুন রাষ্ট্রের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। তবে, এই তৎপরতার মধ্যে লক্ষণীয় অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক, পরিবেশ বিপর্যয়কে সমগ্র বিশ্ববাসীর সাধারণ সংকট হিসেবে না দেখে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করা হচ্ছে অথবা তার যথাযথ মীমাংসার জন্য কালক্ষেপ করা হচ্ছে। দুই, শিল্পায়িত অতি অগ্রসর সভ্যতার প্রতীক দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থে অভ্যন্তরীণ দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৎপর হয়েছে; দূষণ বিরোধী বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগও চলছে। কিন্তু দূষণের দায় নিজেরা স্বীকার না করে সেসব দেশ চেষ্টা করে চলেছে অন্য দেশের ওপর সেই দায় ন্যস্ত করার। তিন, উন্নত দেশগুলি থেকে বড়ো করে দেখানো হচ্ছে

অনুন্নত দেশে অঙ্গার-ভিত্তিক জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার, নানা প্রয়োজনে অরণ্য-নিধন, অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারের দরুন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি। অন্যদিকে অনুন্নত দুনিয়ার পক্ষে সংগতভাবেই আপত্তি জানিয়ে বলা হচ্ছে অনুন্নয়নের দায় নিতেই হবে পশ্চিমি উন্নত দুনিয়াকে। কারণ ঔপনিবেশিক পর্বে অনুসৃত শোষণনীতির ফলেই অনুন্নত দশায় ভুগছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি। উন্নত দেশগুলির শিল্প প্রযুক্তি ও ভোগবাদী জীবনযাত্রা প্রকৃতিকে যেভাবে ধ্বংস করছে, তার পরিমাণ শতগুণে বেশি অনুন্নত দুনিয়ার তুলনায়। চার, উন্নয়ন-অনুন্নয়নের বিতর্কে আজ পর্যন্ত ভালোভাবে বিবেচনা করাই হয়নি বিকল্প অথচ সহনশীল কোনো পথ আছে কিনা যার দ্বারা, উন্নয়নকে স্থগিত না রেখেও, প্রকৃতির সমূহ ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো যায়। পাঁচ, আজ সারা পৃথিবী যে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েছে, তার থেকে রক্ষা পেতে হলে বিশ্বজোড়া যৌথ উদ্যোগ ছাড়া কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। অথচ, উন্নত দুনিয়া নিজেদের স্বার্থে দূষণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করে চলেছে, অনুন্নত দেশগুলিও যাতে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে, তেমন কোনো সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠছে না। অর্থাৎ সমগ্র বিষয়টি রয়ে গেছে রাজনীতির আবর্তে। পরিবেশ নিয়ে রাজনীতি কতদূর যেতে পারে তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমেরিকা। পৃথিবীর উষ্ণায়ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলের প্রমাণিত সতর্কবাণী নিয়ে যখন সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং জলবায়ু স্বাভাবিকীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় নানা নিষেধ-বিধি মানতে প্রস্তুত (এবিষয়ে পরে কিয়োটো প্রটোকল সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিত জানা যাবে), তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রপতি বুশ অম্লান বদনে জানিয়ে দিয়েছেন এসব নিয়মনির্দেশ তাঁদের দেশের ব্যবসায়িক স্বার্থ-বিরোধী এবং তাঁরা কোনোভাবেই মানতে রাজি নন। অথচ ঐ দেশেরই প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি আল্ গোরে সাংবাদিক সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন (11 December, 1997) :

> Over the course of the next century, it will mean that our children's future will be more secure from the dangers that scientists have warned about.

আমেরিকার মধ্যে চুক্তি নিয়ে যে বিরোধ দানা বেঁধেছে, সে সব যে সংকীর্ণ স্বার্থ প্রসূত ও মারাত্মক Al Gore তা প্রমাণ করার জন্য দেশে বিদেশে সর্বত্র প্রচার চালিয়েছেন। এই সৎপ্রয়াসের জন্য তিনি Nobel পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বুশ শুধু যে পরিবেশ সংরক্ষক আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মানতে নারাজ তাই নয়। তিনি পাল্টা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে বিশেষত জনবহুল দেশ চীন ও ভারতের প্রতি, যেখানে নাকি মানুষের চাপে দূষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবেশ বিপর্যয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

সমকালীন বিশ্বে সর্বকালের সর্বাধিক বিপদ দেখা দিয়েছে সভ্যতার আত্মঘাতী দুই অপকর্মে। তার একটি, ব্যাপকতম ধ্বংসক্ষম মারণাস্ত্রের উৎপাদন। অন্যটি শিল্পায়িত নাগরিক সভ্যতার অমেয় চাহিদা পূরণের জন্য দিন দিন প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং জ্ঞাতসারে পরিবেশ ধ্বংসের আয়োজন। দুই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীতে প্রাণের বিলোপ অনিবার্য, যদি না সচেতনভাবে মানবসমাজ এর প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। দ্বিতীয় যে বিপদের কথা বলা হল, সেটি এতই দ্রুত এগিয়ে আসছে যে অবিলম্বে পরিবেশ সংরক্ষণের সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সমগ্র মানবসমাজকে একযোগে দায়িত্ব নিতে হবে কারণ এই গ্রহের প্রকৃতি ও পরিবেশ একটা অখণ্ড ব্যবস্থা যা রাজনৈতিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়; সুতরাং আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথভাবে এবং জাতীয়স্তরে নিজস্ব প্রয়াসে পরিবেশ বিপর্যয় রোধের কার্যক্রম রূপায়িত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ পরিবেশ ব্যাপারটি এমনই যে একাধারে এটি স্থানিক (local) আবার বিশ্বজনীনও (global)।

বিপর্যয়ের উৎপত্তি ও বিপদ সংকেত

যেখানেই প্রাণের প্রকাশ সেখানেই তার পূর্ব শর্ত অনুকূল পরিবেশ। উদ্ভিদজগৎ থেকে প্রাণীজগৎ সর্বত্রই জীবন সৃষ্টি ও জীবনরক্ষায় পরিবেশ হল অপরিহার্য সহায়ক। এর মধ্যে মানুষ আবার এমন জীব যে তার বুদ্ধির গুণে পরিবেশের দ্বারা শুধু উপকৃতই নয়, পরিবেশের নিয়ন্তাও হয়ে উঠতে চেয়েছে। সভ্যতার উন্মেষের পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ অবিরত চেষ্টা করে চলেছে প্রকৃতি থেকে যাবতীয় সম্পদ আহরণ ও নিষ্কাশন করে তার অভাব মেটানোর। বিচিত্র কারণে মানুষের এই অভাব আজ সীমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমত, পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমবর্ধমান হারে। ফলে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদ মেটাতে এবং তার ওপর বিত্তবান শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবনের নানা উপকরণ জোগাতে পৃথিবীর সম্পদের ওপর প্রচণ্ড টান পড়েছে। মহাত্মা গান্ধী যথার্থই বলেছেন, "The earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed." ফলে, পৃথিবীর জৈব অজৈব সমস্ত সম্পদ এমনকি বিশুদ্ধ জল ও বাতাস পর্যন্ত ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। একদিকে প্রকৃতি থেকে অবিরত শোষণ চলছে, অন্যদিকে

ক্ষয়প্রাপ্ত প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনের কোনো সচেতন প্রয়াস এতকাল দেখাই যায়নি। জল-বায়ু-মাটি-জলাশয় এবং জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সব কিছু দূষণের শিকার। শুধু শিল্পের বর্জ্য পদার্থ নয়, কৃষি উৎপাদনেও নানাপ্রকার ক্ষতিকারক কীটনাশক ও রাসায়নিকের ব্যবহার পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। আবার প্রযুক্তির ভ্রান্ত প্রয়োগে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে—নদ-নদী তার স্বাভাবিক স্রোত ও গতিপথ হারাচ্ছে; আরল সাগর ও মেক্সিকো উপসাগর এখন প্রায় মৃত এক অঞ্চল। পৃথিবীর বুকে অরণ্য আবরণ ক্রমেই ক্ষয়িত হচ্ছে। বিলুপ্ত হচ্ছে নানা জীববৈচিত্র্য। সরস সবুজ তৃণক্ষেত্র পরিণত হচ্ছে মরুভূমিতে। খাদ্যাভাব এবং জলাভাব যে অচিরেই মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন তথা অস্ত্রনির্মাণের জন্য পরমাণুশক্তির ব্যবহার থেকে সম্ভাব্য বিদূষণ রোধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা দিচ্ছে। ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। অন্যত্র বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ (harmful wastes) নিরন্তর নিক্ষেপের ফলে স্তূপীকৃত আবর্জনায় জলস্থল দূষিত হচ্ছে। সবুজ সমতল হঠাৎ পরিণত হচ্ছে মরুভূমিতে। হ্রদ অঞ্চল শুকিয়ে যাচ্ছে। নদ-নদী নাব্যতা হারাচ্ছে।

বিপদ শুধু জলে স্থলেই নয়, ঘনিয়ে আসছে অন্তরীক্ষেও। বায়ুদূষণ এখন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে প্রতি দশকেই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে—ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে সামান্য উর্ধ্বস্তরে জড়িয়ে থাকছে উষ্ণ গ্যাসীয় আস্তরণ যার বৈজ্ঞানিক নাম Greenhouse Gas যা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। পরিণাম : Global Warming বা পৃথিবীর উষ্ণায়ন। কারণ, কলকারখানা থেকে, বাতানুকূল গৃহ-অভ্যন্তর থেকে, লক্ষ-লক্ষ মোটর-চালিত যানবাহন থেকে অবিরাম উত্থিত গ্যাস যা বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যায় না; আটকে পড়ে এবং সঙ্গে থাকে বহন করে আনা কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন কণা। বায়ুমণ্ডলে CFC নামক গ্যাসকণার জমাট বাঁধার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে গৃহীত সূর্যের তাপ বিকীর্ণ হতে পারে না। ঐ গ্যাসকণাগুলির উপস্থিতিতে মস্ত বড়ো ক্ষতি হয় ozone স্তরের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি (ozone hole) হলে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি কুমেরু অঞ্চলের ওপর ওজন ছিদ্র ধরা পড়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র আটাশ কি.মি. ঊর্ধ্বে। ফলে সূর্যালোকের সঙ্গে আগত নানা মহাজাগতিক রশ্মির সংস্পর্শে জীবদেহে ক্যান্সার জাতীয় মারণব্যাধির উপক্রম হতে পারে।

উষ্ণায়নের অপর বিষময় পরিণাম, কুমেরু অঞ্চলের (antarctic) জমাট বাঁধা বিশাল বরফ-গঠিত প্রান্তরে ভাঙন এবং তরলায়ন, যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠা ও পৃথিবীতে নিম্ন উচ্চতায় অবস্থিত বহু ভূখণ্ডের (যার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপসহ সুন্দরবনও রয়েছে) জলমগ্ন হয়ে তলিয়ে যাওয়া একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।